দিনের
গান

বানান || নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা || ফেরদাউস মিক্বদাদ
প্রচ্ছদ || কাজী যুবাইর মাহমুদ

যাপিত দিনের গান

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

যাপিত জীবনের গান

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

প্রথম প্রকাশ: ***রজব ১৪৪৩ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০২২***

© সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড ২০২২

ISBN: 978-984-8046-45-6

একুশে বইমেলা পরিবেশক: পারিজাত প্রকাশন

MRP: ৳ ১৭০ মাত্র।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

যাপিত দিনের গান

আপনেগো মতো ফকিন্নি মানুষ এই কারণেই রিকশায় উডাই না। রিকশায় উইঠ্যা জায়গা পর্যন্ত গিয়া রাস্তাত দাঁড়াইবেন। এর পরে গিয়া কতক্ষণ ডাইনে বামে তাকাইবেন। তারপর মুখটারে লুলা রমিজের মতো দুঃখী দুঃখী বানায় কইবেন— 'ভাইসাব, মানিব্যাগ রেকে এসেচি'।

বলেই পিচিক করে থুথু ফেলল সবুজ লুঙ্গি পরা জাহাঙ্গীর। সে পেশায় রিকশাচালক হলেও ভাবগতি দেখলে মনে হয় সম্রাট শাহজাহান।

রিকশার পাশে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে ছেলেটি। চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তামাশা দেখার জন্য লোকের কোনো অভাব হয় না; কিন্তু এগিয়ে আসা লোক খুব হাতে-গোনা।

আস্তে আস্তে লোক জড়ো হচ্ছে। এক সিএনজিওয়ালা এসে থামল। ভিড় ঠেলে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারখানা কী।

পুরাতন ধাঁচের দোতলা বাড়ির টানা বারান্দা থেকে নিউটন সাহেব এক দৃষ্টিতে তামাশা দেখছেন। নিচে ঘটতে থাকা তামাশার সবই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

বর্তমানে সিএনজিওয়ালা খুব বিজ্ঞের মতো নানান ধরনের প্রশ্ন করে যাচ্ছেন সম্রাট রিকশাওয়ালাকে। রিকশাওয়ালা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেই চলেছে—

-ভাইসাব, এই লোক শনির আখড়া থিকা রিকশায় উঠছে, রাস্তাত তিন জায়গাত থামসে, আমারে বহায়া থুইয়া কাজকাম করসে, এহন শাহজাহানপুর আইয়া থামসে। পকেট খামছায়-খুমছায় কয়—বাইসাব মানিবেগ রেকে এসেচি। কেমুনডা লাগে কন।

সিএনজি ড্রাইভার বাম দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তর্জনী ঝড়ের বেগে চালিয়ে কানের ভিতর

থেকে কিছু একটা বের করবার চেষ্টা করছে। ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছে কানের ভিতর সোনার মুদ্রা হারিয়ে গেছে। সেটাই টেনে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরপর কান চুলকানো শেষ করে অতি সিরিয়াস চেহারা করে বলছে—

'মেজাজ তো গরম হওনেরই কথা।'

আশপাশের আরও কিছু মানুষ সমযোগে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

ছেলেটি এখন আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিউটন সাহেব চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। কামিনী ফুল ফুটেছে। সবুজ পাতাগুলো সাদা সাদা ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে। এক ধরনের বাসি ও বিষণ্ন গন্ধ ছড়াচ্ছে ফুলগুলো; কিন্তু এই ঘ্রাণ মাথা পর্যন্ত ঢুকে যায়। উনি নাকে টেনে ঘ্রাণ নিয়ে চোখ বুজলেন। ঘ্রাণটাতে নিউটন সাহেব তার মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পান। মা মারা গেছে প্রায় তেরো বছর, তবু কী স্পষ্ট সেই ঘ্রাণ। কঠিন চেহারার সেই মহিলা, দেখলেই কেমন ভয় ভয় লাগত; অথচ গায়ে কী মিষ্টি ঘ্রাণ। মা মারা যাবার পরদিন উনি হাঁটতে হাঁটতে একটা অচেনা রাস্তায় চলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ দেখলেন মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পাচ্ছেন। সেটার উৎস ধরে যেতেই দেখলেন একটা আধুনিক ছয়তলা বাড়ির গেইটের পাশে এক প্রকাণ্ড কামিনী ফুলের গাছ। সেই গাছ সাদা ফুলে ঢেকে গেছে। সেই ফুলের ঘ্রাণ পুরো এলাকা দখল করে নিয়ে গাছসহ গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। নিউটন সাহেব সেদিন আবিষ্কার করলেন তার মায়ের গা থেকে ঠিক এরকম ঘ্রাণ আসত। মনে মনে ভীষণ অবাকও হলেন, মা বেঁচে থাকতে কেন কখনো বুঝতে পারেননি! উনি সেই রাতে, সারারাত সেই গাছের পাশে বসে ছিলেন। দারোয়ান বারবার জিজ্ঞেস করলেও উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাচ্ছিলেন। কোনো জবাব দেননি। ভোরে অচেতনমতো হয়ে গেলে দারোয়ান তার পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোন বের করে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওনার বাড়ির কেয়ারটেকারকে ডেকে নিয়ে আসেন।

নিউটন সাহেবের বয়স এখন সাতান্ন; তবে দেখতে একটু বেশি বয়সি মনে হয়। তার চেহারা খুব সাধারণ, কিন্তু চোখের মণির রং গাঢ় নীল। এই চেহারার মাঝে নীল চোখ খুব বেমানান লাগার কথা ছিল; কিন্তু অজানা কোনো এক কারণে মনে হয় যেন ঠিক এই চেহারায় এরকম একটা চোখই তো হবার কথা। ওনার আরও একটা অদ্ভুত বিষয় আছে। উনি যখন হাঁটেন, তখন মাথাটা সামান্য বাঁ পাশে হেলিয়ে অনেকটা

বুকের কাছে ঠেকিয়ে হাঁটেন। দেখে মনে হয় নিজের বুকে কান লাগিয়ে কিছু একটা শুনবার চেষ্টা করছেন। নিউটন সাহেবের পায়ে কোনোরকম সমস্যা না থাকলেও পা একটু টেনে হাঁটেন। ওনার বয়স তখন বারো-তেরো হবে, উনি হঠাৎ এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন ওনার পোলিও হয়েছে। পোলিওতে এক পা চিকন হয়ে গেছে। আর একটা ছোট মেয়ে সোনালি চুলের, তার সঙ্গে মিলে ভিক্ষা করছেন। সেই মেয়ে স্বপ্নে তার বড় বোন, মিতা আপা। অনেক আগে থেকেই মিতা আপাকে উনি চিনেন। মিতা আপা শুধু স্বপ্নেই আসেন। স্বপ্নে দুজন মিলে নানান অদ্ভুত কাজকারবার করেন।

আজকের স্বপ্নে উনি একটু পরপর সেই সোনালি চুলের মেয়েকে বলছেন—মিতা আপা, ভাত খাব। আমার পেটে খিদা। তার স্বপ্নের বোন মিতা ভাইকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে সামনে এগোচ্ছে, এর ওর কাছে বলছে—আমার ভাই, নাম নিউটন, তার খিদা লাগসে, ১ টাকা দেন।

ছোট নিউটন বোনের সঙ্গে সঙ্গে পা টেনে টেনে হাঁটছে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাবার সময় নিউটন পা টেনে টেনে হাঁটা শুরু করল। মা যতই বকেন, জানতে চান পায়ে কী হয়েছে, সে কিছুতেই বলবে না। মাথা নিচু করে রাখে। পরে ডাক্তার দেখিয়েও লাভ কিছু হয়নি। সেই থেকে আজ অবধি পা টেনেই হাঁটেন নিউটন সাহেব।

নিউটন সাহেব কামিনী গাছের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আরও একবার নিচে তাকালেন। আরও তিন-চারজন রিকশাওয়ালা যোগ হয়েছে। উনি রুমের দিকে গিয়ে খাটের পাশে রাখা মানিব্যাগ থেকে তিনশো টাকা বের করে বাসার মেইন গেইট খুলে ইয়াসিন আলিকে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন। ইয়াসিন আলি এই বাড়ির কেয়ারটেকার। নিউটন সাহেবের সমবয়সি।

-ইয়াসিন, গেইট খুলে বের হয়ে বাম পাশে দেখবে ছাপা প্রিন্টের নীল শার্ট পরা এক রিকশাওয়ালা আছে। তার পাশে কালো রঙের টিশার্ট পরা শুকনামতো একটা ছেলে দাঁড়ানো। তুমি প্রথমে রিকশাওয়ালাকে এই তিনশো টাকা দিয়ে বলবে—শনির আখড়া থেকে শাহজাহানপুরের ভাড়া, সঙ্গে সঙ্গে তিনবার বসিয়ে রাখার ওয়েটিংচার্জসহ আছে। তারপর পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বলবে, আমি ডেকেছি।

ইয়াসিন কথা না বাড়িয়ে টাকা নিয়ে রওনা হলো। মনে মনে ভাবছে, শনির আখড়া থেকে শাহজাহানপুরের ভাড়া ওয়েটিংচার্জসহ হলেও তিনশো টাকা হওয়ার কোনো

কারণ নেই।

গেইট দিয়ে বেরুতে বেরুতেই ভাংতি পঞ্চাশ টাকা আলাদা করে ফেলল। মনে মনে ভাবছে—

‘আমার কাম রিকশাওয়ালারে ভাড়া বুঝাইয়া বিদায় করা। বুদ্ধি খাটায়া পঞ্চাশটা টেকা পকেটে রাখতে পারলে সমস্যাটা কই। এইটা আমার বুদ্ধির কামাই।’

ইয়াসিন আলির বাবা খোরশেদ আলি মূলত এই বাড়ির কেয়ারটেকারের দায়িত্ব পালন করত নিউটন সাহেবের মামার আমল থেকে। নিউটন সাহেবের ছোটবেলার খেলার সাথি বলতে এই ইয়াসিন আলিই ছিল। নিউটন সাহেবের মামা আতাহার খান নিউটন সাহেব এবং ইয়াসিন আলি দুজনকে একই স্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছিলেন; কিন্তু ইয়াসিনের কাছে পড়ালেখা ছিল ‘বেআক্কেল মাইনষে’র কাম। তাই একদিন ঘোষণা দিলো, সে গাড়ির মিস্ত্রী হবে। কিছুতেই পড়ালেখার মতো তুচ্ছ কাজ সে করবে না। শেষ পর্যন্ত তার গাড়ির মিস্ত্রী হওয়া হয়নি। জগতে মানুষ তার ইচ্ছামতো খুব কমই হতে পারে।

ছোটবেলার ইয়াসিন আর নিউটন নামের দুজন প্রাণের বন্ধু ‘তুই’ বলে ডাকলেও বড় হয়ে ইয়াসিন অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে সম্বোধনহীনভাবে বন্ধুর সঙ্গে দৈনন্দিন কথাবার্তা চালিয়ে যায়। নিউটন সাহেব কি করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তুমিতে ফিরে এসেছেন।

ছেলেটির নাম অরুণ। অরুণ কাচুমাচু হয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকল। ড্রয়িংরুমে কাঠের সোফা। পুরাতন আমলের ডিজাইন। পুরো ড্রয়িংরুমে দুই সিটের একটা সোফা ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই। আর রুমের মাঝখানে একটা বট বনসাই। দেখেই বোঝা যায় অনেক দিনের পুরাতন। রুমটার ভিতরে ঢুকলেই মনে হয় এই বাড়ি, এই ড্রয়িংরুম এই সবকিছুতে অদ্ভুত একটা প্রাচীন ব্যাপার আছে। ঘরের প্রতিটা কোণ কী জানি একটা বলে ফেলতে চাচ্ছে, একটু মন দিয়ে শুনলেই ধরে ফেলা যাবে; কিন্তু কোনো একটা কারণে ধরা যাচ্ছে না।

অরুণের রুমটাতে ঢুকেই মায়ের কথা মনে হলো। মায়ের গায়ের সুতি শাড়ির রোদে শুকানো ঘ্রাণ নাকে আসল। মায়ের রোগাক্রান্ত মুখটা অরুণ জোর করে সরিয়ে দিতে চাইল। বাবার ঘামে ভেজা পিঠ, অনেক দরাদরি করে বাজার থেকে অল্প কিছু বাজার আনা ক্লান্ত চেহারাও দূর করে দিতে ইচ্ছে করছে। অরুণের খুব পুকুর ঘাটলায় লেবু

অরুণের অবাক হবার পালা। অরুণের এরকম অবাক হওয়া হকচকিয়ে যাওয়া চেহারা দেখতে নিউটন সাহেবের অসম্ভব ভালো লাগছে।

***

বায়তুল মোকাররমের নিচ তলায় ছোট্ট একটা কলমের দোকান নিউটন সাহেবের। ইকোনমিক্সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ালেখা করে ওনার মামা যখন উনাকে নিজের ব্যবসায় ঢুকে যেতে বললেন, উনি জানালেন কাঠের গন্ধে নাকি ওনার দম আটকে আসে। সেই আমলে শাহজাহানপুর এলাকার সবচেয়ে বড় কাঠের ব্যবসা ওনার মামা আতাহার খানেরই ছিল। আতাহার খানের কোনো সন্তান না থাকায় ধরে নিয়েছিলেন নিউটনই তার ব্যবসার হাল ধরবে। ওনার স্ত্রী ছেলে হবার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যান। ছেলেটাও সাতদিন পরে মারা গেল।

নিউটন সাহেবের এখনো মামার অবাক দৃষ্টি চোখে ভাসে। ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট বেরোনোর পর মামা এলাকার সব লোককে মিষ্টি খাইয়েছিলেন। উজ্জ্বল চোখ-মুখ নিয়ে রাতে ঘরে ফিরে নিউটন সাহেবকে বললেন,

-কিরে নি, কেমন লাগছে বেটা? এবার দোকানে বোস। বিয়ে থা দিই।

-কোন দোকানে?

-এই কথার কী মানে দাঁড়ায়? কোন দোকানে মানে? আমার দোকানে।

-মামা কাঠের গন্ধে আমার দম আটকে আসে।

ওনার মামা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। উনাকে দেখে মনে হচ্ছিল এর চেয়ে আজব কথা কেউ কোনো কালে তাকে বলেনি। কিছুক্ষণ থেমে উনি বলেছিলেন,

-তাহলে তুমি কী করতে চাও? মায়ের মতো চাকরি? সারাজীবন অন্যের চাকর হয়ে থাকতে চাও?

-উঁহুঁ।

-তবে? সন্ন্যাসী হবে? বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে?

-না। আমি একটা দোকান দেখেছি বায়তুল মোকাররমে।

-তো কি সেই দোকানে আতর টুপি জায়নামাজ—এইসব বিক্রি করতে চাও?

-জি না। কলম।

-কলম মানে? কলম মানেটা কী?

-কলম মানে যেটা দিয়ে লিখে আর কি?

-তুমি কি কোনোভাবে আমার সাথে ফাজলামি জাতীয় কিছু করার চেষ্টা করছ।

-জি না মামা।

-ইকোনো ডিএক্স কলম বিক্রি করবে? দুই টাকায় আট আনা লাভ থাকল। নিজেকে নায়ক জাফর ইকবাল মনে করছ বোধ করি।

নিউটন সাহেব কোনো জবাব দেননি সেদিন; কিন্তু উনি ঠিক তিন মাসের মধ্যে দোকান ভাড়া নিয়ে কলম বিক্রি করা শুরু করলেন। নানান ধরনের কলম; দেশি, বিদেশি। এর মধ্যে অনেক দামি কলমও আছে। ফাউন্টেন পেন, পার্কার থেকে শুরু করে ইকোনো ডিএক্স। কীভাবে কীভাবে যেন সেই কলমের দোকান বিখ্যাত হয়ে গেল। বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকরা ওনার দোকান থেকে কলম কেনে। মন্ত্রী-এমপিরাও আসা-যাওয়া করে। উনি সারাদিন নানান কিসিমের মানুষ দেখেন। ওনার বড় ভালো লাগে। এদের সঙ্গে হালকা গল্পগুজব করেন। আর অসম্ভব গোটা গোটা অক্ষরে দর্শনের কথাবার্তা লিখেন। ওনার কিছু নিজস্ব দর্শন আছে। ওনার দোকানে আসা বেশিরভাগ কাস্টমারই অনেক পুরাতন। ওনারা সম্ভবত নিউটন সাহেবের উচ্চমার্গীয় ফিলোসফি শুনতেই আসেন। প্রতিদিন ওনার দোকানে আসা এগারো নম্বর কাস্টমারকে উনি খুব দামি একটা কলম গিফট করেন। ভিতর থেকে টুল টেনে বের করে বসতে দেন। আগে চা খাওয়াতেন, এখন দিন পালটেছে। মানুষ এখন কফি খেতে ভালোবাসে। এর মধ্যে একটা বড়লোকি ব্যাপার আছে বোধ হয়। তাই তিনি কফির ব্যবস্থাও রেখেছেন। যেদিন এগারো নম্বর কাস্টমার মেয়েদের মধ্যে কেউ হয়, সেদিন উনি খুব বিপাকে থাকেন। মেয়েদের সঙ্গে টুল নিয়ে গল্প করা যায় না। দামি কলমও গিফট করা যায় না। সেদিন উনি তেরো নম্বর কাস্টমারকে টার্গেট করেন। কপাল খারাপ থাকলে পনেরো পর্যন্তও যাওয়া লাগে।

আজ নিউটন সাহেবের তেরো নম্বর কাস্টমারে যাওয়ার দিবস। এগারো নম্বরে আজকে রাগী রাগী চেহারার এক মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়ের বয়স তেরো-চৌদ্দ হবে। সারাক্ষণ মায়ের ভয়ে তটস্থ হয়ে ছিল। নিউটন সাহবের খুব ইচ্ছা করছিল সোনালি রঙের খুব সুন্দর একটা কলম মেয়েটাকে উপহার দিতে; কিন্তু মেয়ের মা এমন দৃষ্টিতে নিউটন সাহেবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সারাক্ষণ, যেন উনি

সাতান্ন বছর বয়সের কোনো সাধারণ মানুষ নন; বরং একজন পটেনশিয়াল রেপিস্ট। এখুনি ওনার মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। উনি খুব দ্রুত মা-মেয়েকে বিদায় করে মাথাটা বুকের কাছে বাম দিকে কাত করে হেলিয়ে দিলেন। উনাকে দেখে মনে হলো কিছু একটা শুনবার চেষ্টা করছেন।

নিউটন সাহেব ভাবছেন একজন নারী তার জীবন আসলে কাটায় কীভাবে? তার জীবনে তিন শ্রেণির নারী দেখেছেন। এক শ্রেণি অসম্ভব সাবমিসিভ গোছের। এদের দেখলেই মনে হয় এরা ক্লাইম্বিং ট্রি। এর তার কাধে ভর দিয়ে চলার জন্য মন এবং শরীর নিয়ে একেবারে হেলে পড়ে আছে। এরা কোনোমতে জীবনটা পার করে যায় শুধু। নিজেদের নিয়ে এদের যেন ভীষণ লজ্জা। বাবা, স্বামী কিংবা সন্তান সবার সামনেই এরা তটস্থ থাকে। ভালো একটা মাংসের টুকরো নিতেও এদের ভীষণ লজ্জা হয়, কারও সামনে বিছানায় আয়েশে গা এলিয়ে দিতে এদের লজ্জা হয়, নিজের জন্য কিছু কিনতে এদের লজ্জা হয়। এদেরকে এভাবেই গড়ে তোলা হয়। কাপড় দিয়ে শারীরিক লজ্জা ঢাকার মতো করে এরা জগতের যাবতীয় বিষয়ে নিজেদের বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য করে মনের লজ্জা ঢাকে।

আরেক শ্রেণির নারী আছে বিদ্রোহী গোছের। এরা সব সময় নিজের অস্তিত্ব আর অধিকার জানান দেওয়ার জন্য উন্মুখ থাকে। সংসারে স্বামী নিজের ইচ্ছায় একটা পানির জগ কিনলেও এরা তারস্বরে চ্যাঁচায়, জানান দেয় তার পছন্দ কিংবা ইচ্ছার বাইরে গিয়ে এই যে জগটা কেনা হয়েছে, এতে তার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এরা নিজেদের শারীরিক সম্ভ্রম রক্ষা করতে জগতের সব পুরুষকে সন্দেহের চোখে দেখে। একটু আগে আসা রাগী চেহারার মহিলাটি দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা আসলে প্রথম শ্রেণির নারীদেরই মুদ্রার অন্য পিঠ। কে জানে এদের জীবনের কোনো অন্ধকার দিনে এদের হয়তো পার করতে হয়েছে নিকৃষ্টতম কোনো ঘটনা।

এই দুই শ্রেণির মেয়েদের জন্যই নিউটন সাহেবের বড় মায়াবোধ হতে লাগল। তবে ওনার সবচেয়ে বেশি মায়া হয় তৃতীয় শ্রেণির জন্য। এরা প্রকৃত নির্বোধ। এরা পুরুষ হতে চায়। নারীর আদলে পুরুষ হবার কোনো নিয়ম প্রকৃতিতে নেই। এরা মনে করে পুরুষ লোকের মতো রাস্তার পাশে প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন করলে নিজেকে কিছু একটা প্রমাণ করা যাবে। এরা মনে করে মাঝ রাতে রাস্তার ফুটপাতে বসে গাঁজায় টান দিলে এদের পুরুষের মতো সাহসিকতা দেখানো হবে; অথচ এদেরও গভীর রাতে হাপুস নয়নে কেঁদে বড্ড নারী হতে ইচ্ছা করে, খুব আদর আদর নরম রোদের দিনে রুই মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট রেঁধে ঘরের অগোছালো গৃহকোণ সাজাতে ইচ্ছা হয়।

নিউটন সাহেবের প্রাক্তন স্ত্রীর কথা খুব মনে পড়তে চাইল। মাথা ঝাঁকিয়ে সুহাসিনীকে উনি দূর করে ফেলার চেষ্টা করলেন। অনেকটা মিষ্টির ওপর ভনভন করে ঘুরতে থাকা মাছি যেভাবে তাড়ায়। সুখ আসলে কোথায়? ওনার কেন জানি হঠাৎ-ই মনে হতে থাকে—এই যে তিন শ্রেণির নারী, এদের সবার একটা জিনিস খুব কমন। এরা খুব রকম সম্মান আর স্বাধীনতার অভাবে ভোগে। আর একেক শ্রেণি একেক রকমভাবে হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই। এরপর জগাখিচুড়ি টাইপ একটা ব্যাপার ঘটে; অথচ ওরা সবাই একই মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন রূপে। যতন করে পালা পোষা কবুতরকে যখন সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়, সন্ধ্যার লাল আলোতে ওরা নিজেই ফিরে আসে; অথচ খাঁচায় চব্বিশ ঘণ্টা বেঁধে রাখা কবুতর জীবনে একদিনও যদি সুযোগ পায়, ডানা ঝাপটে পালিয়ে যেতে চায় অন্য কোনো ভুবনে। অথচ ততদিনে ওর বাইরে বেঁচে থাকবার ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেছে। ও না মরতে পারে, না পারে বাঁচতে।

সুহাসিনীর সঙ্গে ওনার সাত মাসের সংসার জীবনে সুহাসিনী আসলে খুব কি বেশি কিছু চেয়েছিল? চায়নি তো। শুধু নিউটন সাহেবের বুঝতে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল।

-চাচাজান, সেলো ম্যাক্সরাইটার দেন না? বারোটা দেন।

নিউটন সাহেবের তেরো নম্বর কাস্টমার সামনে দাঁড়ানো। রাত প্রায় নয়টা। একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলে। হয়তো ইউনিভার্সিটিতে মাত্র উঠেছে। একটা ব্রাউন কালারের কাগজের প্যাকেটে একটা সেলো ম্যাক্সরাইটার সঙ্গে একপাতা রিফিল ঢুকালেন। সাথে নীল রঙের একটা পাইলট কলম ভরে ফেললেন।

-চাচাজান, আমি তো পাইলট কলম চাইনি।

-জানি তো। এইটা তোমার চাচাজানের তরফ থেকে গিফট। আর শোনেন রিফিল দিয়ে যদি কাজ চলে, তাহলে বারোটা কলমের দাম কেন দেবেন আব্বাজান। রিফিল দিয়ে দিলাম, শেষ হয়ে গেলে বদলায় ফেলবেন।

ছেলেটিকে টাকা মিটিয়ে দিয়েই নিউটন সাহেব দোকান থেকে বের হয়ে শাটার লাগিয়ে রওনা দিলেন। রাতের ঢাকা শহরে হাঁটতে ওনার বড় ভালো লাগে। রাতে তাই হেঁটেই বাড়ি ফেরেন বেশির ভাগ দিন। শহরের রাস্তা এই সময় আস্তে আস্তে কর্মযজ্ঞ গুটিয়ে ফেলতে শুরু করে। কেমন একটা হাহাকার জাগানিয়া ব্যাপার আছে। ল্যাম্পপোস্টগুলো একরাশ আলো বুকে নিয়ে কীরকম একটা বোকা বোকা মুখ করে

দাঁড়িয়ে থাকে। সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট, কিন্তু ওনার কেন জানি এদের দেখে খুব একলা লাগে। যেন এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সমুদ্রের মাঝে মাপা মাপা দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে; তবু কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না। কী ভীষণরকম শূন্যতা সবার বুকে। আচ্ছা এই যে মানুষগুলো হেঁটে চলে, রিকশায় চলে কিংবা শাঁ করে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়, এরাও কি খুব একলা না? কেউ কি সত্যিকার অর্থে কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে? হাতের মতো মনেরও যদি পাঁচটা করে আঙুল থাকত, তাহলে মনেরা মনেদের আঙুলে আঙুলে শক্ত করে ধরে ফেলতে পারত। তখন মনে হয় এরকম ভীষণ একলা লাগত না।

আজ রাতে এই কংক্রিটের শহরের মানুষগুলোকে একটু বেশি রকমেরই বিষাদগ্রস্ত মনে হচ্ছে; অথচ শহর আজকে চন্দ্রাহত না, আধখানা চাঁদ উঠেছে, তবে সারি সারি মেঘ এসে প্রায়ই তাকে ঢেকে দিয়ে যাচ্ছে, আবার যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে। ভাদ্র মাসের গরমে নাকি তাল পাকে, তবু শহর আজকে মানুষদের বাতাসের ত্রাণ দিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষেরা খুব গভীর কোনো মনের অসুখ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হেঁটে চলছে এরকম মনে হচ্ছে। সেই গভীর গোপন অসুখ ধরা যায় না। কেউ কারোটা ছুঁয়ে দিতে পারছে না। আহারে কী অদ্ভুত অজানা শোক।

নিউটন সাহেব ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে উঠেন,

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা

কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা

ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা

যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা

সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে

মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরুপ্রান্তরে

ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে

কাঁদে তখন আকুল-মন, কাঁপে তরাসে

কী হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে

তোমারে দাও, আশা পূরাও, তুমি এসো কাছে

বাড়িতে ঢুকতেই ইয়াসিনের নাতনির সঙ্গে দেখা হলো নিউটন সাহেবের। ইয়াসিনের

মেয়েটা জন্ডিসে মারা গেল দুই বছর আগে। সেই থেকে নানা-নানির সঙ্গেই থাকে। ওর বাবা মাঝেমধ্যে মেয়ের জন্য খাবারদাবার, খেলনা নিয়ে আসে। কিছুদিন আগে শুনেছে আবার নাকি বিয়ে করেছে।

নানাজান! নানাজান!

উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে ছুটে আসে পুতুল। পুতুলের বয়স নয় বছর। দেখতে লাগে পাঁচ-ছয়। ইয়াসিন তাই নাতনিকে মাঝেমধ্যে আহ্লাদী করে ট্যাবলেট ডাকে। নিউটন সাহেবের সামনে যদিও ডাকে না। ছোটদের সম্মান দেওয়াটা জরুরি। এমনিতে এখন নিউটন সাহেব ছোটবেলার মতো তুই তোকারি না করলেও, পুতুলকে যেদিন প্রথম ট্যাবলেট ডাকতে শুনেছিল, সেদিন বজ্রকণ্ঠে ঝাড়ি দিয়েছিল—শোন ইয়াসিন, বাচ্চাদের তুই তোকারি করবি না। সবার একটা সম্মান আছে। তারপর ইয়াসিন আর কথা বাড়ায়নি। কী দরকার আধা পাগল মানুষের সঙ্গে বাহাসে যাওয়ার। তাই বলে ট্যাবলেট ডাকাও বন্ধ করেনি।

-কিরে ছোট্ট পুতুল রানি, তুমি কেমন আছ?

-আমি তো ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

-ভালো আছি তো।

-আমার জন্য কলম এনেছ? সুন্দর গন্ধ বেরোয় এরম কলম এনেছ নানাজান?

নিউটন সাহেব পকেট থেকে কলম বের করে দিলেন।

-আজ কয়টা পুতুল বানিয়েছ পুতুল রানি?

-পাঁচটা, তুমি দেখবে?

-কাল দেখব পুতুল রানি। আর শুধু পুতুলই বানাচ্ছ, না পড়ালেখাও কিছু হচ্ছে।

-অল্প অল্প হচ্ছে তো।

-ঠিক করে পড়ালেখা করো, আমি তোমাকে একটা বড় পুতুলের দোকান বানিয়ে দেবো। তুমি সেইখানে এরকম নাক মুখ চোখ ছাড়া পুতুল রাখবে। লোকজন এই আজব পুতুল কিনতে তোমার দোকানে আসবে। সব বাচ্চারা বলবে—এমা, পুতুল রানির তো খুব মজা। এত্ত বড় হয়েছে, পড়ালেখা শিখেছে তবু, সারাদিন পুতুলের সঙ্গে থাকে। খুব ভালো হবে না তখন?

-হবে তো।

পুতুলের নানি রমেসা ঘোমটা টেনে এসে পুতলকে ডাকল—এই পুতলা, খাইতে আয়। ঘুমাইতে হইব তো, স্কুলে যাবি না কাল?

নিউটন সাহেব আজ পর্যন্ত কোনো দিন রমেসার চেহারা দেখেননি। সব সময় এমন ঘোমটা টানা অবস্থাতেই দেখেছেন।

-নানাজান, আজকের পুতুলের মধ্যে তিনটা মেয়ে আর দুইটা ছেলে। এদের নামও রেখেছি। শুনবা নানাজান?

-বলো পুতুল রানি। বলে খাবার খেতে চলে যাও, কেমন!

-ইরি, কিরি, মিরি আর ছেলে দুইটার নাম বীর ও মীর।

-বাহ, খুব সুন্দর নাম। শুভরাত্রি পুতুল রানি।

রমেসা দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বলল,

-ভাইসাব, আপনের রাইতের খানা ঢাকা দিয়া রাইখা আসছি টেবিলের ওপরে।

-আচ্ছা ঠিক আছে।

রমেসা গত পচিশ বছর যাবৎ নিউটন সাহেবের বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করে। ওনার মা বেঁচে থাকতে ওপরেই রান্না-খাওয়া সব হতো। এমনকি নিউটন সাহেবের সাত মাসের সংসারেও সুহাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকত এই রমেসা।

এরপর মা মারা যাওয়ার পর রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা নিচেই হয়। নিউটন সাহেব দোকানে গেলে রমেসাই ছুটা একজন বুয়াকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে রাখে এবং সকালের আর রাতের খাবার ওপরে পাঠিয়ে দেয়। সপ্তাহে একদিন উনি দোকানে যান না, সেদিন তিনবেলার খাবারই পাঠান। নিউটন সাহেব ইয়াসিনের পরিবারসহ মাসের বাজারের টাকা একেবারেই দিয়ে দেন শুরুতেই।

এই বাড়িতে আগে গিজারের ব্যবস্থা ছিল না; তবে মিথ কানাডা যাবার আগে এই গিজার লাগানোর ব্যবস্থা করে গেছে। এতে অবশ্য নিউটন সাহেবের ভালোই হয়েছে। বয়স হয়েছে বেশ। রাতে গোসলের আগে হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল করতে ভালোই লাগে। শরীর জানান দিতে চায়, বেশি ওস্তাদি করো না, আরামের সময় হয়েছে হে!

এক বাটি সবজি আর দুইটা লাল আটার রুটি ঢাকা দেওয়া আছে। রাতে এই খাবারই

খান উনি। এক হাতে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে ছেলের নম্বরে ডায়াল করলেন। কয়েকবার ফোন বাজতেই ওপাশ থেকে মিথ খলবল করতে করতে বলে উঠল,

-হ্যালো বাবা, তুমি কেমন আছ?

-ভালো আছি, তুমি কেমন আছ?

-আমি কেমন আছি সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ পড়ালেখার চাপে মাথার যে দু-তিনটা স্ক্রু অবশিষ্ট ছিল, সেগুলোও যাবে যাবে করছে। সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভের নিচে নেমে গেলেই স্কলারশিপ গন। সাথে সাথে আমিও গন। আর এই দেশে রিকশাফিকশাও নেই যে, পড়ালেখা বাদ দিয়ে চালানো শুরু করব। আই উইল বি অ্যা ডেড ম্যান দেন বাবা।

-ও আচ্ছা। পড়ালেখা করতে করতে কোনো একদিন বিদ্যাসাগর হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে। তুমিও কি বইয়ের পাতা ছেঁড়া শুরু করে দিয়েছ নাকি।

-ধ্যাত্তেরি বাবা, তোমার গম্ভীর কণ্ঠে ফাজলামি করবার স্বভাব কোনো দিন যাবে না দেখা যাচ্ছে। আর শোনো, আমি আর কথা বলতে পারব না। দুপুর সাড়ে বারোটা বাজে। আমি শাওয়ার নেব, খাব এরপর লাইব্রেরি যাব। ভালো থেকো বাবা। কেমন?

-আমি ভালো থাকি। তুমি পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে গায়ে আলো-বাতাসও লাগিয়ো মাঝেসাঝে। রাখছি।

-লাভ ইউ বাবা।

নিউটন সাহেব কিছু বললেন না, ফোনের লাইন কেটে দিলেন।

রাত বারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। নিউটন সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ ধরে একটা টিকটিকি একটু সময় বাদে বাদে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে যাচ্ছে। উনি ডান দিকে কাত হয়ে শুলেন। কিছুতেই ঘুম আসছে না। এরকম নির্ঘুম রাত উনি ভীষণ ভয় পান। এরকম রাতগুলোতে ওনার ভেতর ভেঙেচুরে আসে। কীরকম একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার শুরু হয়ে যায়। মনে হতে থাকে ভেতর থেকে পশু টাইপের কিছু একটা তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে, সেই চিৎকার বাইরে বেরোচ্ছে না, আতঙ্কে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা ভয়ের স্রোত বয়ে যাওয়া শুরু করে। এই ভয়টা ঠিক কীসের, উনি বলতে পারেন না। অশরীরী কিছু মনে হয় কখনো, আবার কখনো মনে হয় উনি আসলে নিজেকেই ভয় পাচ্ছেন। ছোটবেলা থেকেই তার এইরকম একটা কিছুর